

আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ গায়ওয়ায়ে আহযাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ) (غَزْوَةُ الْأَحْزَابِ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

গায়ওয়ায়ে আহযাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ)

এক বছরকালব্যাপী উপর্যুপরি সামরিক অভিযান এবং কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে আরব উপদ্বীপে শান্তি ও স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সর্বত্র সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। কিন্তু যে সকল ইহুদীকে নিজেদের দুষ্কর্ম ও চক্রান্তের কারণে নানা প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনার আশ্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল তখনো তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, অঙ্গীকারভঙ্গ, ধোকাবাজি, আমানতের খেয়ানত ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্মের অশুভ ফলাফল থেকে কোন শিক্ষাই তাদের হয়নি। কাজেই, মদীনা থেকে বহিস্কৃত হয়ে খায়বার যাওয়ার পর মুসলিম ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে যে সামরিক টানাপোড়েন চলছিল তার ফলাফল কী দাঁড়ায় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য তারা অপেক্ষমান থাকে। কিন্তু যখন তারা প্রত্যক্ষ করল যে, পরিস্থিতি ক্রমেই মুসলিমগণের অনুকূলে যাচ্ছে এবং তাঁদের শাসন ক্ষমতা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে তখন তারা হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। শেষ বারের মতো মুসলিমগণকে এমন এক চরম আঘাত হানার জন্য তারা প্রস্তুতি শুরু করে দিল যাতে তাঁদের জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মুসলিমগণের সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা করার সাহস তাদের ছিল না সেহেতু এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন করল যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

বনু নাযীর গোত্রের ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মক্কার কুরাইশগণের নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে এবং যুদ্ধে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যও নিশ্চয়তা প্রদান করে। সেহেতু উহুদ যুদ্ধের দিন কুরাইশরা পুনরায় মুসলিমগণের সঙ্গে বদরে মোকাবেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে যোদ্ধা হিসেবে তাদের যে সুখ্যাতির হানি হয় তা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই বনু নাযীরের প্রস্তাব তাদের উৎসাহিত করে এবং তারা তা মেনে নেয়।

এরপর ইহুদীগণের এ দলটি বনু গাত্তাফান গোত্রের নিকট যায় এবং কুরাইশদের মতো তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। অধিকন্তু, এ প্রতিনিধি দলটি আরবের অবশিষ্ট গোত্রগুলোর নিকট ঘোরাফিরা করে তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করতে থাকে। যার ফলে তারা অনেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এভাবে ইহুদীগণ অত্যন্ত কার্যকরভাবে নাবী কারীম (ﷺ), ইসলামী দাওয়াত এবং মুসলিমগণের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের বড় বড় গোত্র এবং দলগুলোকে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে নেয়।

অতঃপর নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দক্ষিণদিক হতে কুরাইশ কিনানাহ এবং তুহামায় বসবাসরত দ্বিতীয় হালিফ (চুক্তিবদ্ধ) গোত্রসমূহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এদের সংখ্যা ছিল চার হাজার এবং সার্বিক নেতৃত্বে ছিল আবু সুফইয়ান। এ বাহিনী মাররুয যাহরান গিয়ে পৌঁছেলে বনু সুলাইম গোত্র এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করে। ঐ সময় পূর্বদিক হতে গাত্তাফানী গোত্র ফাযারা, মুররাহ এবং আশজা গোত্র রওয়ানা হয়ে যায়। ফাযারাহর সেনাপতি

ছিলেন উয়াইনাহ বিন হাসান, মুররাহর গোত্রের নেতৃত্বে ছিল হারিস বিন আউফ এবং বনু আশজা গোত্রের নেতৃত্বে ছিল মিসআর বিন রুহাইলাহ। তাদের নেতৃত্বাধীনে বনু আসাদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন গোত্রের অনেক লোকজনও এসেছিল।

উল্লেখিত গোত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় এবং নির্ধারিত কর্মসূচি মোতাবেক মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এ প্রেক্ষিতে কয়েক দিনের মধ্যেই মদীনার আশপাশে দশ হাজার সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী সমবেত হল। তারা এত বেশী সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেছিল যে মদীনার মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকের সমষ্টিগত সংখ্যার চাইতেও তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বেশী। শত্রুপক্ষের এ সৈন্য সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যদি আকস্মিকভাবে মদীনার দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যেত তাহলে মুসলিমগণের জন্য তা হতো অত্যন্ত বিপজ্জনক। তখন এতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই থাকত না যে, মুসলিমগণের মূলোৎপাটন করে তাঁদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হত।

কিন্তু মদীনার নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন মস্তিষ্ক এবং পরিচালনা ছিল নিচ্ছিদ্র যত্নশীল। তাঁর সচেতন হস্তের আগুলগুলো সর্বক্ষণ পরিস্থিতির নাড়ির গতির উপর ছিল বিদ্যমান। পরিস্থিতির গতিধারার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ঠিক ঠিক আঁচ অনুমান ও তথ্য পরিবেশন এবং তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ অবলম্বন করে আসছিলেন। কাজেই কাফিরদের বিশাল বাহিনী যখনই মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য সচেষ্ট হল তখনই মদীনার সংবাদ সরবরাহকারীগণ পরিচালকের নিকট ত্বরিত সংবাদ পরিবেশন করলেন।

সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণের পরামর্শ বৈঠক আহবান করেন এবং প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে সলা পরামর্শ করেন। শুরার প্রতিনিধিগণ অনেক চিন্তা ভাবনার পর সর্বসম্মতক্রমে সালামাহন ফারসী (রাঃ)-এর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সালামাহন ফারসীর (রাঃ) প্রস্তাবটির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ : ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! পারস্যে যখন আমাদেরকে অবরোধ করা হতো তখন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থানে পরিখা খনন করে নিতাম।’

প্রতিরোধ সংক্রান্ত এ প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। আরববাসীগণ এ প্রস্তাবের হেকমত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ অবলম্বন করেন। এতে প্রতি দশ জনের উপর ৪০ (চল্লিশ) হাত পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দায়িত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিখা খননে আত্মনিয়োগ করেন। নাবী কারীম (ﷺ) এ কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে থাকেন এবং নিজেও পুরোপুরিভাবে ওতে অংশগ্রহণ করেন। সাহল বিন সা’দ হতে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) –এর সঙ্গে আমরা খন্দকে ছিলাম। লোকজনেরা খনন করছিলেন এবং আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঠ করলেন, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِشْ إِلَى عِيشِ الْآخِرَةِ، فَاعْفُ رِلْمُهُ جَرِينِ وَالْأَنْصَارِ** অর্থ: ‘হে আল্লাহ! পরকালীন জীবন তো হচ্ছে প্রকৃত জীবন, অতএব মুহাজিরীন এবং আনসারগণকে ক্ষমা করে দাও।’[1]

আনাস হতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খন্দকের দিকে আগমন করলেন তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, এক শীতের সকালে আনসার ও মুহাজিরীনগণ খনন করছেন। তাদের নিকট এমন কোন দাস নেই যে তাদের পরিবর্তে দাসগণ এ কাজ করে দেয়। তাদের কষ্ট এবং ক্ষুধার ভাব দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

اللهم إن العيش عيش الآخرة ** فاغفر للأتصار والمهاجرة

‘হে আল্লাহ! অবশ্যই, পরকালীন জীবনটাই প্রকৃত জীবন। অতএব, আনসার এবং মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।
আনসার এবং মুহাজিরগণ প্রত্যুত্তরে বললেন,

نحن الذين بايعوا محمداً ** على الجهاد ما بقينا أبداً

অর্থ: ‘আমরা সেই ব্যক্তি যারা মুহাম্মাদ (ﷺ)–এর হস্তে জিহাদের বাইআত করেছি, আমাদের এ প্রতিজ্ঞা চূড়ান্ত ও স্থায়ী।[2]

সহীহুল বুখারীতে বারা’ বিন আযিব হতে বর্ণিত আছে, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। এ মাটি বহন করার কারণে তাঁর দেহ মুবারক ধূলি ধূসরিত হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় তাঁকে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينه علينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا

إن الألى رغبوا علينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম না, আমরা দান খায়রাত করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। অতএব আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গে যদি আমাদের মোকাবেলা হয় তাহলে আমাদেরকে ধৈর্য্যদান করিও। তারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করেছে। যদি তারা ফেৎনা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে আমরা কখনই মাথা নত করব না।

বারা’ বিন আযিব বলেছেন, ‘শেষের শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিক টান দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন, অন্য একটি বর্ণনায় করিতাটির শেষাংশ ছিল নিম্নরূপ :

إن الألى قد بغوا علينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا

অর্থ: ‘তারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে এব তারা যদি আমাদেরকে ফেৎনায় নিক্ষেপ করতে চায়, আমরা কখনই মাথা নত করে তা মেনে নেব না।’[3]

মুসলিমগণ একদিকে এতই আবেগের সঙ্গে কাজ করছিলেন, অপর দিকে তাঁদের ক্ষুধার তাড়না এত অধিক ছিল যে, তা চিন্তা করতে গেলে অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, পরিখা খননরত মুসলিমগণের জন্য যে সামান্য পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আনা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। এ দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।[4]

আবু ত্বালহাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর নিকট আমরা ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং নিজ নিজ পেটের আবরণ উন্মোচন করে পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখা পাথর দেখালাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপন পেটের আবরণ উন্মোচন করে দেখালেন যে, তাঁর পেটের দুটি পাথর বাঁধা আছে।[5]

পরিখা খননকালে নবুওয়াতের কতিপয় নিদর্শনও প্রকাশিত হয়। সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, নাবী কারীম (ﷺ)–এর তীব্র ক্ষুধার ব্যাপারটি অবগত হয়ে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন

এবং তাঁর স্ত্রী এক সা' (আনুমানিক আড়াই কেজি) যব পিসে আটা তৈরি করলেন। অতঃপর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীসহ একান্তে তাঁর বাসায় তশরীফ আনয়নের জন্য নাবী কারীম (ﷺ)-কে অনুরোধ পেশ করলেন। কিন্তু নাবী কারীম (ﷺ) পরিখা খননরত সকল সাহাবী (রাঃ)-কে (যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার) সঙ্গে নিয়ে তাঁর গৃহে গমন করলেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে এ স্বল্প খাদ্যে সাহাবীগণের সকলেই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন অথচ মাংসের পাত্রে সাবেক পরিমাণ মাংস অবশিষ্ট রইল এবং আটার পাত্রেও সাবেক পরিমাণ আটা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় ক্রমাগতভাবে রুটি তৈরি হতে থাকল।[6]

তাঁর পিতা এবং মামাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নু'মান ইবনু বাশীরের বোন অল্প খেজুরসহ খন্দকের নিকট আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা চেয়ে নিয়ে একটি কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দেন। অতঃপর খননরত সাহাবীদের দাওয়াত দিয়ে তা খেতে বললেন। সাহাবীগণ খেতে থাকলে খেজুরের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে সকল সাহাবীর খাওয়ার পরেও এ পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রইল যে, তার কিছু পরিমাণ কাপড়ের বাইরেও পড়েছিল।[7]

খন্দক খনন কালে উপর্যুক্ত ঘটনাবলীর চাইতেও উল্লেখযোগ্য আরও ইমাম বুখারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেন, আমরা পরিখা খনন কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। কয়েকজন সাহাবী নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! একটি অত্যন্ত শক্ত গোছের পাথর আমাদের খনন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।'

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'আমি অবতরণ করছি', অতঃপর তিনি যখন সেখানে তশরীফ আনয়ন করলেন তখনো তাঁর পেটের উপর একটি পাথর বাঁধা ছিল। আমরাও তিন দিন যাবৎ কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করি নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ খন্ডের উপর আঘাত করলেন তখন তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে স্তূপে পরিণত হয়ে গেল।[8]

বারা' (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'খন্দক খনন কালে এক স্থানে একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর দৃষ্টিগোচর হল। এ পাথরটিকে কোদাল দ্বারা আঘাত করলে সে আঘাতে পাথরটির কিছুই হল না, বরং কোদাল প্রত্যাহাত খেয়ে ফিরে আসতে থাকল। উপায়ান্তর না দেখে নাবী কারীম (ﷺ)-কে ব্যাপারটি অবহিত করা হল। ব্যাপারটি অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে আগমন করলেন এবং কোদাল হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলার পর পাথরটিকে আঘাত করলেন। এ আঘাতের ফলে পাথরের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বললেন,

(اللَّهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ، وَاللَّهُ إِنِّي لَأَنْظُرُ قُصُورَهَا الْحُمْرِ السَّاعَةِ)

'আল্লাহ আকবার! আমার হাতে সিরিয়া দেশের চাবি কাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী আছে, সেখানকার লাল দালানগুলো আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।'

অতঃপর যখন তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন তখন অন্য একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি বললেন,

(اللَّهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيتُ فَارِسٌ، وَاللَّهُ إِنِّي لَأَبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الْأَبْيَضِ الْآنَ)

'আল্লাহ আকবার! আমাকে পারস্য সাম্রাজ্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী, এ সময় আমি মাদায়েনের সাদা

দালানাগুলো প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর বিসমিল্লাহ্ সহকারে তিনি তৃতীয় বার আঘাত করলেন। তখন পাথরটির অবশিষ্টাংশ ভেঙ্গে পড়ল। এবার তিনি বললেন,

(اللَّهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ، وَاللَّهُ إِنِّي لِأَبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي)

‘আল্লাহ আকবার! আমাকে ইয়ামান রাজ্যের চাবিগুলো প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী, এখন আমি সানআর সিংহদ্বার প্রত্যক্ষ করছি।[9] সালমান ফারসী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত থেকে ইবনু ইসহাক অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন।[10]

যেহেতু উত্তর দিক ছাড়া অন্যান্য সব দিক থেকেই মদীনা নগরী পাহাড়, পর্বত এবং খেজুর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল সেহেতু একজন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ সৈনিক হিসেবে যথার্থই তিনি ধারণা করেছিলেন যে, মদীনার উপর এত বিশাল এক বাহিনীর আক্রমণ একমাত্র উত্তর দিক থেকেই সম্ভব হতে পারে এবং সেই দিকেই তিনি পরিখা খনন করেছিলেন।

মুসলিমগণ পরিখা খনন কাজ একটানা অব্যাহত রাখেন। দিবা ভাগে তাঁরা খনন কাজ চালিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে যেতেন। এভাবে মদীনার পার্শ্ববর্তী দেয়াল পর্যন্ত কাফিরদের সুসজ্জিত সৈন্যদল পৌঁছার পূর্বেই নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খন্দক তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।[11]

এদিকে চার হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত কুরাইশ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী রুমাহ, জুরফ এবং জাগাবার মধ্যবর্তী মাজমাউল আসয়াল নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। অন্যদিকে গাত্তাফান এবং তাদের নাজদী সঙ্গীরা ছয় হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে উহুদের পূর্ব পাশে যামবে নাকনী নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এহেন পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

(وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا) [الأحزاب: 22].

‘মু’মিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল- আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়া‘দা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আগ্রহই বৃদ্ধি পেল।’ [আল-আহযাব (৩৩) : ২২]

কিন্তু মুনাফিক এবং দুর্বল অন্তঃকরণের লোকদের দৃষ্টি যখন সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর পতিত হতো তখন তাদের অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا) [الأحزاب: 12].

‘আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল- আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়া‘দা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ [আহযাব (৩৩) : ১২]

যাহোক, শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ অগ্রসর হলেন এবং সালা পর্বতকে পিছনে রেখে শিবির স্থাপন করলেন, সম্মুখভাগে ছিল খন্দক যা মুসলিম এবং কাফিরদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক প্রাচীর হিসেবে বিদ্যমান ছিল। মুসলিম প্রতীক চিহ্ন (কোড পরিভাষা) ছিল [حَمْ لَا يُنْصَرُونَ] (হামীম, তাদেরকে সাহায্য করা হবে না)। এ সময় মদীনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়

ইবনু উম্মু মাকতুমের উপর। মদীনার মহিলা এবং শিশুদেরকে নগরের দুর্গ ও গর্তসমূহে সুরক্ষিত রাখা হয়।

আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ যখন মদীনার দিকে অগ্রসর হল তখন প্রত্যক্ষ করল যে, একটি প্রশস্ত পরিখা তাদের এবং মুসলিমগণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে অবরোধ সৃষ্টির কথা ভাবতে হল অথচ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় এ রকম কোন চিন্তা ভাবনা কিংবা প্রস্তুতি তাদের ছিল না। কারণ প্রতিরোধের এ পরিকল্পনা তাদের নিজেদের কথা অনুযায়ী এমন একটি চাতুর্যপূর্ণ কৌশল যে সম্পর্কে আরবগণের কোন ধারণা ছিল না। কাজেই, এ ধরনের রণ-কৌশল সম্পর্কে তারা চিন্তাই করে নি।

খন্দকের নিকট উপস্থিত হয়ে মুশরিকগণ তাদের ধারণাভীত এ রণ-কৌশল প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং ক্ষিপ্ততার সঙ্গে চক্র দিতে থাকল। এ অবস্থায় তারা এমন কোন দুর্বল স্থানের অনুসন্ধান করছিল যেখান দিয়ে অবতরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। এদিকে মুসলিমগণ তাদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাছিলেন এবং তারা যাতে খন্দকের নিকটবর্তী হতে সাহসী না হয় এ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তীর নিক্ষেপ করছিলেন যাতে তারা খন্দকের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়তে কিংবা অংশ বিশেষ ভরাট করে ফেলে পথ তৈরি করে নিতে না পারে।

এদিকে কুরাইশ আশ্বারোহীগণ এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না যে খন্দকের পাশে অবরোধ সৃষ্টি করে ফলাফলের আশায় অনর্থক অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ তারা বসে থাকবে। এ জাতীয় ব্যবস্থা ছিল তাদের অভ্যাস ও শানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই, তাদের একটি দল যার মধ্যে ছিল ‘আমর বিন আবদে উদ্দ, ইকরামা বিন আবু জাহল এবং যারবার বিন খাত্তাব একটি সংকীর্ণ স্থান দিয়ে খন্দক পার হয়ে গেল এবং তাদের ঘোড়াগুলোও সালায়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্র দিতে থাকল। পক্ষান্তরে আলী এবং কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) খন্দকের যে অংশ দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিল সেখানে অবস্থান নিয়ে তাদের পথ বন্ধ করে দিলেন। এর প্রেক্ষিতে ‘আমর বিন আবদে উদ্দ সামনা সামনি মোকাবেলার জন্য উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান জানাল। আলী (রাঃ) তার সঙ্গে মোকাবেলার জন্যে মুখোমুখি হয়ে এমন এক বাক্য উচ্চারণ করেন যার ফলে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় সে ঘোড়া হতে লাফ দিয়ে অবতরণ করে। সে অশ্বের পদযুগল কর্তন ও অবয়ব বিকৃত করত- সে অন্যতম বীর ও সাহসী মুশরিক ছিল। আলী (রাঃ)-এর সম্মুখে এসে পড়ে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে শুরু হল মোকাবেলা। চলল উভয়ের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের পালা। অবশেষে প্রবল আঘাত হেনে আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য মুশরিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় খন্দক পেরিয়ে পলায়ন করে। তারা এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, পলায়নের সময় ইকরামা তার বর্শা ফেলে দিয়ে পলায়ন করে।

মুশরিকগণ কোন কোন সময় খন্দক অতিক্রম করে যাওয়ার কিংবা এর প্রশস্ততা কমিয়ে পথ তৈরি করে নেয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু মুসলিমগণও খন্দক থেকে তাদের দূরে রাখার লক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে যেতে থাকেন। তারা অদম্য সাহস এবং দক্ষতার সঙ্গে তীর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিপক্ষের তীরন্দাযির মোকাবেলা করে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেন।

শত্রুপক্ষের সঙ্গে অব্যাহত মোকাবেলা করার কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীগণ (রাঃ)-এর পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় নি। যেমনটি সহীহাইনের মধ্যে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন উমার বিন খাত্তাব আগমন করেন এবং কাফিরগণ সম্পর্কে কিছু ভালমন্দ কথা বলার পর আরজ করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! অদ্য সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় খুব কষ্টে সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, (وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا) ‘আল্লাহ তা‘আলার শপথ! আমি এখনো সালাত আদায় করতে পারি নি।’

এরপর আমরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে বুতহান নামক স্থানে অবতরণ করি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে অযু করেন এবং আমরাও অযু করি। অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করেন। এটি ছিল সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার পরের কথা। এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করা হয়।[12]

নির্দিষ্ট সময়ে এ সালাত আদায় করতে না পারার কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি বদ দু‘আ করেছিলেন। বুখারী শরীফে আলী (রাঃ)-এর রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)

‘হে আল্লাহ! ঐ সকল মুশরিকের বাড়িঘর ও কবর এমনভাবে আগুণে পরিপূর্ণ করে দাও যেভাবে তারা আমাদেরকে ‘সালাতে উস্তা’ বা মধ্যবর্তী সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে এবং এভাবে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।[13]

মুসনাদে আহমাদ এবং মুসনাদে শাফেয়ীতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-কে জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করা থেকে বিরত রাখে। এ প্রেক্ষিতে তিনি একত্রে এ সালাত আদায় করেন। ইমাম নাবাবী বলেন, ‘উল্লেখিত বর্ণনা সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে সমাধান হবে, খন্দক যুদ্ধের কয়েকদিন পর্যন্ত এ সমস্যা চালু ছিল। কাজেই, কোন দিন এ রকম এবং অন্য দিন ভিন্ন রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।[14]

এখান থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকগণের পক্ষ থেকে খন্দক অতিক্রম করার প্রচেষ্টা এবং মুসলিমগণের পক্ষ থেকে অব্যাহত প্রতিরোধ কয়েক দিন পর্যন্ত চালু ছিল একটি বিরাট প্রতিবন্ধক, এই জন্যে সামান্যসামান্য সংগ্রামের সুযোগ সৃষ্টি হয় নি। যুদ্ধের গতিধারা তীর নিষ্ক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অবশ্য, তীর নিষ্ক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষেরই কয়েক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা সম্ভব। মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ছয় জন এবং মুশরিকদের পক্ষে দশ জন। এর মধ্যে এক কিংবা দু’ জন তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছিল।

ঐ দু’ প্রতিপক্ষ দলের পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীর নিষ্ক্ষেপের এক পর্যায়ে সা‘দ বিন মু‘আয তীরবিদ্ধ হন। তীরের আঘাতে তাঁর হাতের মূল শিরা কতিত হয়। হেববান বিন আরাক নামক এক কুরাইশীর তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। আহত হওয়ার পর তিনি প্রার্থনা করেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, যে সম্প্রদায় তোমার রাসূল (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাকে দেশ হতে বাহির করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারটি আমার নিকট যত প্রিয়, অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকট ততটা প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! আমি মনে করি যে, এখন তুমি তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছ। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে এখনো যদি কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমাকে তাদের জন্য অবশিষ্ট রেখে দাও যেন আমি তাদের সঙ্গে জিহাদে লিপ্ত হতে পারি। আর যদি তুমি যুদ্ধ শেষ করে থাক তাহলে এ আঘাতকে বাকী রেখে এটাকে আমার মৃত্যুর কারণ করে দাও।[15]

তিনি তাঁর দু‘আয় সর্বশেষে বলেছেন, বনু কুরাইযাহর ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু

দিও না।

যে প্রকারেই হোক এক দিকে মুসলিমগণ শত্রুদের সামনাসামনি হয়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানে তৎপর রয়েছেন, অন্য দিকে ষড়যন্ত্রকারী এবং কপটদের শঠতা স্বর্প আপন গর্তের মধ্যে কুন্ডলী পাকাচ্ছে এবং প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যে, তারা মুসলিমগণের দেহে গরল ঢেলে দেবে। যেমন বনু নাযীরের বড় অপরাধী হুওয়ায় বিন আখতাব বনু কুরাইযাহর আবাসস্থলে এসে তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ কোরযীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ কা'ব বিন আসাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বনু কোরাইয়ার পক্ষ থেকে অঙ্গীকার পালনের অধিকার রাখত এবং যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে এ চুক্তি করেছিল যে, যুদ্ধের সময় সে তাঁকে সাহায্য করবে। (যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) হুওয়ায় এসে যখন দরজায় করাঘাত করে তখন সে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু হুওয়ায় তার সঙ্গে এমন এমন সব কথাবার্তা বলতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য সে দরজা খুলে দেয়। হুওয়ায় বলল, 'হে কা'ব! আমি তোমার নিকট যুগের ইজ্জত এবং জোয়ারের সাগর নিয়ে এসেছি। আমি নেতা ও পরিচালকগণসহ মুশরিকদেরকে নিয়ে এসে রুমার মাজমাউল আসয়ালে অবতরণ করিয়েছি। তাছাড়া, বনু গাত্তাফানকে তাদের পরিচালক ও নেতৃবৃন্দসহ উহুদের নিকট যামবে নাকমীতে শিবির স্থাপন করেছি। তারা আমার সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছে,

‘মুহাম্মাদ এবং তার সঙ্গী সাথীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তারা এখান থেকে ফিরে যাবে না।’

কা'ব বলল, ‘আল্লাহর কসম! তুমি আমার নিকট যুগের অপমান এবং বর্ষণ-মুখর মেঘমালা নিয়ে এসেছ যা শুধু বিজলীর চমক দিচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে ফলোৎপাদক কিছুই নেই; হুওয়াই, আমি দুঃখিত আমাকে আমার আপন অবস্থার উপর থাকতে দাও। আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মধ্যে সততা ও বিশ্বাস রক্ষা ছাড়া অন্য কোন কিছুই দেখি নি।’

কিন্তু হুওয়াই অনবরত তার চুলের খোপা এবং কাঁধের মধ্যে মোচড় দিতে এবং ফুসলাতে থাকল। এভাবেই তাকে বশীভূত করে ফেলল। অবশ্য এ ব্যাপারে হুওয়াইকে কা'বের সঙ্গে একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়। অঙ্গীকারটি ছিল এরূপ যে, কুরাইশগণ যদি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা না করে ফিরে আসার পথ ধরে তাহলে সেও তাদের সঙ্গে তাদের দুর্গে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের অবস্থা যা হবে তারও তাই হবে। উভয়ের এ অঙ্গীকারের ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কা'বের সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায় এবং এর ফলে মুসলিমগণের সহযোগী হয়ে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তাদের শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করে।[16]

এরপর বনু কুরাইযাহর ইহুদীগণ প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, সাফিয়াহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) হাস্সান বিন সাবেত (রাঃ)-এর ‘ফারে’ নামক দুর্গের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। মহিলা এবং শিশুদের সঙ্গে হাস্সানও (রাঃ) সেখানে ছিলেন। সাফিয়াহ (রাঃ) বলেন, ‘আমাদের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে এক জন ইহুদী গমন করল এবং দুর্গের চারদিকে ঘোরাফিরা করতে থাকল। এটি হচ্ছে সেই সময়ের ঘটনা যখন বনু কুরাইযাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তির শর্তাবলী থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছিল। আর আমাদের এবং তাঁদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে, তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণকে নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় ব্যাপ্ত ছিলেন। আমাদের নিকট আসতে পারতেন না। এ জন্য আমি বললাম, ‘হে হাস্সান! আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এ ইহুদী আমাদের দুর্গের চতুর্দিকে ঘোরাফিরা করছে। আল্লাহর কসম! আমি

আশঙ্কা করছি যে, এ ব্যক্তি অন্যান্য ইহুদীদেরকে আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করে দেবে। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শত্রুর মোকাবেলায় এতই ব্যস্ত রয়েছেন যে, তাঁরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারবেন না। সুতরাং আপনি গিয়ে তাকে হত্যা করে আসুন।

উত্তরে হাসান (রাঃ) বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আপনি জানেন যে, আমি এ কাজের লোক নই।’ সাফিয়্যাহ বললেন, ‘আমি এখন নিজেই কোমর বাঁধলাম। তারপর স্তম্ভের একটি কাঠ নিলাম এবং দুর্গ হতে বের হয়ে ঐ ইহুদীর কাছে গেলাম। অতঃপর ঐ কাঠ দ্বারা আঘাত করে করে তার দফা শেষ করে দিলাম এবং দুর্গে ফিরে এসে হাসান (রাঃ)-কে বললাম, যান, এখন তার অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব পত্রগুলো নিয়ে আসুন। সে পুরুষ লোক বলে আমি তার অস্ত্র খুলিনি। আমার এ কথা শুনে হাসান (রাঃ) বললেন, তার অস্ত্র এবং আসবাবপত্রের আমার কোন প্রয়োজন নেই।[17]

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম শিশু এবং মহিলাগণের হেফাজতের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফুফুর ঐ ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের অত্যন্ত গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে সাধারণ ইহুদীগণের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে এ দুর্গবাসীগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য মোতায়েন রয়েছে এবং এ কারণেই তারা দুর্গের উপর চড়াও হওয়ার সাহস করে নি। অথচ দুর্গের মধ্যে তখন কোন সৈন্যই ছিল না।

তবে মূর্তিপূজক আক্রমণকারীদের সঙ্গে তাদের একাত্মতার প্রমাণস্বরূপ তারা তাদের জন্য রসদ সরবরাহ করতে থাকে। ঐ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তাদের রসদবাহী বিশটি উট আটক করেছিলেন। যাহোক, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ইহুদীগণের অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি এ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের জন্য তৎক্ষণাৎ মনোনিবেশ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বনু কুরাইযাহর মনোভাব অবহিত হওয়ার পর প্রয়োজন বোধে সে আলোকে সামরিক কৌশল পুনর্বিন্যাস করে দেয়া।

কাজেই, এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সা‘দ বিন মু‘আয, সা‘দ বিন উবাদাহ, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা এবং খাওয়াত বিন জোবায়ের (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। বনু কুরাইযাহ সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সঠিক না মিথ্যা সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তিনি তাদের পরামর্শ দেন। যদি সঠিক হয় তাহলে আভাষ ইঙ্গিতে শুধু তাঁর কাছেই তা ব্যক্ত করার জন্য পরামর্শ দেন। সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, যদি তারা অঙ্গীকার মান্য করে চলে তাহলে তা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ ও আলোচনা করার জন্য পরামর্শ দান করেন।

যখন তারা বনু কুরাইযাহর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাদের চরম বিশৃঙ্খল ও উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তারা প্রকাশ্যে গালিগালাজ করল, শত্রুতামূলক কথাবার্তা বলল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি অবমাননা সূচক উক্তি করল। তারা এমন সব কথাবার্তাও বলল, ‘আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে? আমাদের এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মধ্যে কোন অঙ্গীকার নেই।’

বনু কুরাইযাহর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁরা ইঙ্গিতে বললেন, আয়ল ও কারাহ। এর অর্থ হল আয়ল ও কারাহ গোত্র যেমন রাজী এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল, বনু কুরাইযাহর ইহুদীগণও অনুরূপভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

ফুটনোট

- [1] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড বাবু গায়ওয়াতুল খন্দক ৫৮৮ পৃঃ।
- [2] সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড ৩৯৭ পৃ, ২য় খন্ড ৫৮৮ পৃ: ।
- [3] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৫৮৯ পৃঃ।
- [4] সহীহুল বুখারী, ২য় খন্ড ৫৮৮ পৃঃ।
- [5] জামে তিরমিযী, মিশকাত ২য় খন্ড ৪৪৮ পৃঃ।
- [6] এ ঘটনা সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে দ্র: ২য় খন্ড ৫৮৮-৫৮৯ পৃঃ।
- [7] ইবনে হিশাম ২য় খন্ড ২১৮ পৃঃ।
- [8] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৫৮৮ পৃঃ।
- [9] সুনানে নাসায়ী ২য় খন্ড, মুসনাদে আহমাদ। নাসায়ীতে এ শব্দগুলো নাই এবং নাসায়ীতে জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।
- [10] ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ২১৯ পৃঃ।
- [11] ইবনু
- [12] সহীহুল বুখারী, ২য় খন্ড ৫৯০ পৃ:
- [13] সহীহুল বুখারী, ২য় খন্ড ৫৯ পৃঃ।
- [14] শাইখ আব্দুল্লাহ রচিত ‘মুখতাসারুস’ সীরাহ ২৮৭ পৃ: এবং ইমাম নাবাবীর শাবহে মুসলিম ১ম খন্ড ২২৭ পৃঃ।
- [15] ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ২২৭ পৃঃ।
- [16] ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ২২০-২২১ পৃঃ।

[17] ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ২২৮ পৃঃ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6293>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন